দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 23 MAY 2005
পৃষ্ঠা — ১ — কলাম — ৩

৪৮ লাখ ছাত্রী উপবৃত্তি নিয়ে বাণিজ্য ॥ শিক্ষকরা বিব্রত ॥ একটি প্রকল্পের ব্যর্থতা ৬৫ ভাগ

শরিফুজ্জামান পিন্টু ॥ 'আমরা বর্তমান স্ত্রী শিক্ষা প্রণালীর পক্ষপাতি নহি, বহুবার বলিয়াছি এবং তাহার দোষ প্রদর্শনও করিয়াছি। আমরা দেবীকে বিবিভাবে দেখিতে চাহিনা।'— নারী শিক্ষা বিরোধী হিন্দু রঞ্জিকা পত্রিকা ১৮৯৯ সনের ২০, ডিসেম্বর স্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কে এ ধরনের সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। পত্রিকাটির ধারণা ছিল, ইংরেজ সরকার

প্রতিষ্ঠিত স্কুলে মেয়েরা পড়লে তারা খ্রীষ্টান হয়ে যাবে। নারী শিক্ষা সম্পর্কে এমন যুক্তিতর্ক ও বাহাস সেই ব্রিটিশ আমলে শুরু হয়েছিল। এখনও তা চলছে। খ্যাতিমান বীর নেপোলিয়ানের সেই বিখ্যাত এবং বাসি উক্তি প্রাসঙ্গিকতার কারণে বার বার ব্যবহার হয়। তিনি বলেছিলেন,

(৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন)

৪৮ লাখ ছাত্রী

(প্রথম পাতার পর)

তোমরা আমাকে শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদের শিক্ষিত জাতি দেব। আজকের শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, আমরা সার্টিফিকেটধারী মা পেলেও প্রকৃত শিক্ষিত মা পাচ্ছি না।

দেশে সরকারীভাবে নারী শিক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা এখন প্রায় কাছাকাছি। এই সাফল্যের জন্য উপবৃত্তি কর্মসূচীর কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। সরকারী এবং দাতা সংস্থার অর্থায়নে পাঁচ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৪৮ লাখ ছাত্রীকে উপবৃত্তি দেয়া হচ্ছে। কেমন চলছে এসব প্রকল্প?

অনুসন্ধানে দেখা যায়, এক ছাত্রীর নামে ৪৫ রকম স্বাক্ষর দিয়ে উপবৃত্তি নেবার ঘটনাও ঘটেছে। শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ কর্মকর্তা বিষয়টি জানেন এবং এটি দৃষ্টান্ত হিসাবে ব্যবহার হয়। বিয়ের পরও অবিবাহিত মর্মে উপবৃত্তি নেয়া হচ্ছে হরদম। এমনকি নোরাড সাহায্যপুষ্ট এফএসএসপি উপবৃত্তি প্রকল্পের ব্যর্থতা সরকারী মূল্যায়নে শতকরা ৬৫ ভাগ। অন্যান্য উপবৃত্তি প্রকল্পে ব্যর্থতা ২০ থেকে ২৫ ভাগ। গত ২০ এপ্রিল ২০০৫ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ চ্যাপ্টার প্রকাশিত জরিপে বলা হয়েছে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শতকরা ২২ ভাগ ছাত্রী গড়ে ৪৫ টাকা দিয়ে উপবৃত্তি প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হয়। জরিপে অংশগ্রহণকারী ৩৮ ভাগ ছাত্রী বলেছে, তারা সরকার নির্ধারিত টাকার চেয়েও কম পায়। টিআইবির হিসাবে মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তি খাতে ছাত্রীদের বছরে ঘুষ দিতে হয় ২ কোটি ৫৭ লাখ টাকা।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক প্রফেসর দিলারা হাফিজ বলেন, আমাদের দেশ দুর্নীতিমুক্ত নয়, কিছু অনিয়ম তো আছে। তার পরও ছাত্রী উপবৃত্তি চালুর পর অভাবনীয় সাফল্য এসেছে। দৃষ্টান্ত দিয়ে মহাপরিচালক বলেন, ১৯৯০ সালে মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রী সংখ্যা ছিল শতকরা ১৮ ভাগ এবং ২০০২ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৫৩ ভাগ।

ছাত্রী উপবৃত্তি খাতে সরকারের বছরে খরচ প্রায় ৩৫০ কোটি টাকা। উপবৃত্তির শর্ত হিসেবে শ্রেণীকক্ষে ৭৫ ভাগ হাজিরা থাকতে হবে, পরীক্ষায় প্রতি বিষয়ে পেতে হবে ৪৫ নম্বর, আর থাকতে হবে অবিবাহিত। এযে-সংগ্রাম, র মাধ্যমে উপবৃত্তির টাকা উঠিয়ে ভাগ-বাটোয়ারার অসংখ্য নজির রয়েছে।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, সকল শর্ত পূরণ করলে শতকরা ৪০ ভাগ ছাত্রীও উপবৃত্তি পাবার যোগ্য বিবেচিত হবে না। কারণ গ্রামাঞ্চলে পরীক্ষায় সব বিষয়ে ৪৫ পাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। তাই নম্বর হেরফের করেই উপবৃত্তি টিকিয়ে রাখতে হয়। বেশিরভাগ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উপবৃত্তি স্থগিতের কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। কারণ একদিকে দরিদ্র ছাত্রীর লেখাপড়া ছেড়ে দেবার আশঙ্কা, অন্যদিকে অভিভাবক এবং স্থানীয় চাপ।

আটকে থাকে না। গ্রামে এখনও দরিদ্র অভিভাবকের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, সস্তায়(যৌতুক ছাড়া) পাত্র পেলে বিয়ে দেব না কেন? তাছাড়া দু'বছর ভরণপোষণ টানার চেয়ে বিয়ে দেয়াকে শ্রেয় মনে করে অনেক অভিভাবক। পাত্রী হিসেবে গ্রামে কম বয়সী মেয়েদের কদর এখনও বেশি।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত হ্যারি কে টমাস এ দেশে অবস্থানের অভিজ্ঞতায় বলেছেন, বাংলাদেশে ইভ টিজিং এবং যৌন হয়রানি মেয়েদের জীবন বিষিয়ে তুলছে। যারা এই ঘৃণ্য কাজ করছে তাদের বিচার হয় না, ফলে নির্যাতনের মাত্রা সহ্যের সীমা অতিক্রম করে। স্কুলে যাওয়ার পরিবর্তে মেয়েদের বিয়ে দেয়া হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই নির্যাতন ও হয়রানি এমন পর্যায়ে চলে যায় যে, মেয়েরা ভাবে আত্মহত্যাই মুক্তির একমাত্র পথ।

হ্যারি কে টমাস এই অসহনীয় অবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য পুলিশ, শিক্ষক এবং স্থানীয় নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, একটি মেয়েকে উত্যক্ত করা বা তাকে হুমকি দেয়া কোন পৌরুষদীপ্ত কৃতিত্ব নয়। 'ছেলেরা এই রকমই হয়' বলে মেয়ে নির্যাতনের বিষয়টি কখনই এড়িয়ে যাওয়া যাবে না বলে উল্লেখ করেন তিনি।

জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্টের আহ্বায়ক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম বলেন, ছাত্রী উপবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে দেশজুড়ে শিক্ষকরা মারাত্মক সব হয়রানির মুখে পড়ছেন। একজন শিক্ষককে প্রচুর মিথ্যা কথা বলতে হচ্ছে, মিথ্যা রিপোর্ট দিতে হচ্ছে। যে ছাত্রী প্রত্যেক বিষয়ে ৪৫ নম্বর পায় না, তাকে এই নম্বর দিতে হয়। যে ছাত্রীর বিয়ে হয়েছে, এমনকি শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে তাকেও দিতে হয় উপবৃত্তি। আর এসব অসঙ্গতি ধরা পড়লে উপজেলা বৃত্তি কর্মকর্তা হাত বাড়িয়ে দেয়। সব মিলিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভেতর ও বাইরে এই কর্মসূচী নিয়ে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে যা সামগ্রিক লেখাপড়ায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, গ্রামাঞ্চলে ৪৫ নম্বর পাওয়া কঠিন হওয়ায় মন্ত্রণালয় সম্প্রতি প্রস্তাব তোলে এটি কমিয়ে ৪০ নির্ধারণ করা হোক। কিন্তু বিশ্বব্যাংক এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেছে। বিশ্বব্যাংকের যুক্তি হচ্ছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীর সংখ্যা বাড়ানোর চেয়ে এখন শিক্ষার গুণগত মানের দিকে বিশেষ নজর দেয়া হবে।

নারী শিক্ষার বিকাশ এবং নারী সমাজের ক্ষমতায়নে নব্বই দশকের গোড়ার দিকে চালু হয় উপবৃত্তি কর্মসূচী। শুরুতে এই কর্মসূচী অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে তা দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে। পৌর এলাকার বাইরে ছাত্রীরা নির্ধারিত হারে মাসিক উপবৃত্তি ও বই কেনার টাকা পাচ্ছে, বেতনও ফ্রী। কিন্তু যে টাকা একজন ছাত্রী পায় তা বর্তমান বাজারে খুবই অপ্রতুল। ষষ্ঠ শ্রেণীতে ছয় মাসে একজন ছাত্রী পায় ১৫০ টাকা, নবম শ্রেণীতে পায় ৩১০ টাকাসহ বই কেনার টাকা। কিন্তু বই কেনার টাকা দেয়া হয় নির্ধারিত সময়ের বেশ পরে। তাছাড়া ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বই দেয়া হয় না। একজন শিক্ষার্থী উপবৃত্তির যে টাকা পায় তা দিয়ে একটি কামিজও বানানো যায় না।

ছাত্রী উপবৃত্তির প্রভাব আবার অন্যরকম। প্রাথমিক শিক্ষায় উপবৃত্তি ৪০ ভাগ শিক্ষার্থীকে দেয়া হলেও ছাত্রী উপবৃত্তি শর্ত পূরণ করলে সবাই পাচ্ছে। শুরু থেকেই এই প্রকল্পে ভর করেছে দুর্নীতি। উপবৃত্তির সঙ্গে টিউশন ফীর সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রস্তাব উঠলেও তা করা হয়নি। ছাত্রীদের ভুয়া তালিকা প্রণয়ন এবং জাল নম্বরপত্র তৈরি করে উপবৃত্তির টাকা আত্মসাতের অভিযোগ বেশ পুরনো। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, অর্থ বিতরণকারী ব্যাংক এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কিছু কর্মকর্তা যোগসাজশে ভুতুড়ে ছাত্রীর নামে টাকা তোলার অভিযোগ ওঠে প্রায়শ।

উপবৃত্তির টাকা গ্রামের এক শ্রেণীর কিশোরীর ক্ষমতায়ন এত বেশি বাড়িয়েছে যে, অনেক ক্ষেত্রে তারা বেপরোয়া হয়ে উঠছে। টাকার জন্য মা-বাবার কাছে হাত পাতা লাগে না, বলে অনেকের 'ঘোড়াই কেয়ার ভাব'। উপবৃত্তির টাকা সাধারণত অভিভাবকের হাতে যায় না, হাত খরচেই ব্যবহার হয়। এমনকি শিক্ষককেও জিম্মি করার মতো দৃষ্টান্ত রয়েছে। নিয়মিত স্কুলে আসে না, পরীক্ষায় ৪০ ভাগ নম্বর অর্জন করে না, তবু উপবৃত্তি নেয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সুনাম ধরে রাখতে এটুকু অনিয়ম দেখেও না দেখার ভান করে।

এদিকে উপবৃত্তি পাবার শর্ত হচ্ছে অবিবাহিত থাকা। কিন্তু মফস্বলে উপবৃত্তির এই সামান্য টাকার জন্য বাস্তবে বিয়ে